০৯-০৭-১৬ প্রাতঃমুরলী ওমশান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা- এই সভাতে বহির্মুখী হয়ে না বসে, (আত্মিক-স্থিতিতে) বাবার স্মরণে থাকতে হবে, পাত্র-মিত্র, আত্মীয়-সম্বন্ধে অথবা রুজী-রোজগারের বিষয়গুলি স্মরণ করলে, তাতে বায়ুমণ্ডলে বিঘ্ন পড়ে"

প্রশ্নঃ- তোমাদের বাচ্চাদের রুহানি ড্রিলের বিশেষত্বটি কি, যা সাধারণ মানুষ তা করতে পারে না ?

উত্তরঃ- তোমাদের এই রুহানি ড্রিল বুদ্ধির। আর তার বিশেষত্ব এই যে, তুমি আশিক (প্রেমিকা) হয়ে নিজের মাশুককে (প্রেমিককে) স্মরণ করো। এরই ইশারা গীতাতেও আছে- 'মনমনাভব'। কিন্তু মানুষ তার নিজের প্রেমিক পরম-আত্মাকেই জানেই না, তাই তারা সে ড্রিল কি করেই বা করবে। তারা তো একে অপরকে কেবল মাত্র দৈহিক ড্রিলই শেখাতে পারে।

ওঁম শান্তি। বাচ্চারা যেমন বোঝে, বাবাও তেমনি বুঝতে পারেন যে, বাচ্চারা (যারা যোগ শেখায়) তারা এখানে কি করছে ! অর্থাৎ স্মরণের যোগ, সেই যাত্রার ড্রিল করাচ্ছেন। এতে মুখের দ্বারা এমন কিছুই বলার প্রয়োজন পড়ে না। শুধু ধারণা থাকতে হবে, তারা কাকে স্মরণ করছে ? অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা শিবের। যার স্মরণে থাকলেই, আমাদের যা বিকর্মগুলি আছে, সে সবই ভস্ম হয়ে যাবে, ফলে বিকর্ম-জিৎ হওয়া যাবে, যে যত এই স্মরণের ড্রিলে থাকবে- তার ততটাই হবে। যেহেতু এটা আত্মার আত্মিক ড্রিল- যা কোনো শারীরিক ব্যাপার নয়। ভারতে যে সব ড্রিল শেখানো হয়, ও সব তো হলো দৈহিক, কিন্তু এটা তো হলো রুহানি (ঈশ্বরীয়) ড্রিল। আর এই রুহানি ড্রিলকে একমাত্র তোমরা বাচ্চারা ছাড়া অন্যেরা কেউই তা জানে না।

এই রুহানি ড্রিলের কথাই ইশারাতে গীতায় বর্ণিত আছে অবশ্যই। যখন বলা হচ্ছে, 'ভগবানুবাচ' অর্থাৎ ভগবানের বাচ্চাদেরও উবাচ । তোমরাই এখন ভগবান শিববাবার সেই বাচ্চা হয়েছো। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন- 'মামেকম স্মরণ করো' -আমাকেই স্মরণ করতে থাকো। বাবা নিজেই সেই ড্রিল শেখান। বাচ্চারাও আবার সেই ড্রিল অন্যদেরকে শেখায়। কল্প পূর্বেও বাবা ঠিক এ ভাবেই জানিয়েছিলেন যে আমাকেই এই এক বাবাকেই স্মরণ করো। যা বার- বার বলবার দরকার নেই, কিন্তু তবুও তা বলতে হচ্ছে। এখানে বসে কেউ নিজের মিত্র-সম্বন্ধকে, রুজী-রোজগারের বিষয় ইত্যাদি স্মরণ করতে থাকলে তো বায়ুমণ্ডলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। বাবা আরও জানান- এখন যেভাবে এখানে বসে তুমি বাবার স্মরণে আছো, এরকমই ভাবেই চলতে ফিরতে, কর্ম করতে স্মরণের যোগে থাকতে হবে। ঠিক যেমনটি আশিক মাশুককে (প্রেমিকা প্রেমিককে) স্মরণ করে। এই জাগতিক স্মরণ তো দৈহিক ব্যাপার। কিন্তু তোমাদেরটা হলো রুহানি (ঈশ্বরীয়) স্মরণ। আত্মারা

ভক্তি-মার্গেও আশিক (প্রেমিকা) হয় পরমপিতা - পরম-আত্মার মাশুকের (প্রেমিকের)। কিন্তু জাগতিক দুনিয়ার এরা তো সেই মাশুককেই জানে না, আর না তো নিজের আত্মাকেও জানে। সেই মাশুক বাবা এখন এই ধরায় এসে গেছেন। ভক্তি-মার্গের শুরু থেকেই আত্মারা তার আশিক (প্রেমিকা) হয়ে রয়েছে। যেহেতু এটা (পিতা-পুত্র) আত্মা- পরমআত্মার সম্পর্ক। বাবা তার বাচ্চাদেরকে বলেন- তোমরা আশিকরাই এই আমাকেই, অর্থাৎ মাশুক বাবাকে এই ভাবেই ডেকে স্মরণ করো যে, বাবা তুমি এসো। এসে আমাদেরকে দুঃখ মোচন করে মুক্ত করো আর তোমার সাথে শান্তি-ধামে নিয়ে চলো। তোমরা তো জানো, এখন এই দুঃখধাম, মৃত্যুলোক বিনাশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। অমরলোক তো জিন্দাবাদ। আর মৃত্যুলোক মুর্দাবাদ। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ বাচ্চা হয়েছো, তোমাদের মধ্যেও ক্রমানুসার পুরুষার্থ অনুসার হয়। তাই তোমাদের বাচ্চাদের মধ্যেও পুরোপুরি নিশ্চয় হওয়া দরকার যে, আমরা এই সময় কালেই নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হই, ২১ জন্মের জন্য। যেমন কেউ মরলে সেক্ষেত্রে বলা হয় স্বর্গবাসী হয়েছে। কিন্তু কত সময় কালের জন্য সে স্বর্গবাসী হচ্ছে.... .... এটা কিন্তু সেভাবে কেউই জানে না। এখন তোমরা যে পুরুস্বার্থ করছো- তা স্বর্গবাসী হবার জন্যই। আর এই নিশ্চয়টা কে করান ! উঁনি হলেন গীতার ভগবান। কিন্তু উনি তো সেই একজনই -যিনি নিরাকার। মনুষ্যরা ভেবে থাকে নিরাকারের তো আকারই নেই। তাই উনি কি করেই বা এই দুনিয়ায় এসে এসব শেখাবেন ? বাবাকে না জনার জন্য অবিনাশী বিশ্ব নাটকের চিত্রপট অনুসারে, ভুল করে কৃষ্ণের লিখে দিয়েছে। যদিও কৃষ্ণ আর শিবের সম্বন্ধ প্রায় একই সময় কালের কাছাকাছি। শিব-জয়ন্তী হয় সঙ্গমেতে। তারপরে হয় কৃষ্ণ-জয়ন্তী। শিবজয়ন্তী হয় নিশুতি রাতে, আর কৃষ্ণজয়ন্তী হয় প্রত্যুষে, একে প্রভাতই বলবে। যখন শিবরাত্রি পুরো হয় তাররপরেই কিন্তু কৃষ্ণজয়ন্তী হয়। এই সব কথা কেবল তোমরা বাচ্চারাই বুঝতে পারো। এ সবের আবার অনেক কায়দা নিয়মও আছে- মনে রাখতে হবে, এখানে এই সভাতে কেউ যেন বহির্মুখী হয়ে না থাকে। নিষ্ঠা সহযোগে কেবল বাবার স্মরণেই থাকতে হবে। তাই মনুষ্যরাও সেভাবেই বাবাকে ডাকে, হে পতিত- পাবন তুমি এসো, এসে আমাদেরকে পবিত্র-পাবন বানাও। কিন্তু অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট অনুসারে এরা এতই পাথরবুদ্ধির (নির্বুদ্ধি) হয়েছে যে, এসব কিছুই তারা বুঝতে পারে না। যদি তারা তা জানতো তবে অবশ্যই তারা বলতো। তাদের তো এটাও জানা নেই যে, এখন কলিযুগের শেষ-পর্যায়ে আছে তারা। আবার যখন এই সময়ে বাবা এই ধরায় আসেন তখন থেকেই নতুন যুগের সুচনা হয়। বর্তানের মনুষ্যরা তো একদমই ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। লোকরা ভাবে যে, কলিযুগের অন্ত এখনও ৪০ হাজার বর্ষ বাকী আছে। বেহদের বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, এই হদের জাগতিক বাবা কখনও পতিত-পাবন হতে পারে না। 'বাপু' এই নাম তো অনেকের আছে। বৃদ্ধদেরকেও বাপু কিম্বা বাবা বলা হয়। কিন্তু এই রুহানি পিতাশ্রী তো কেবল একজনই আছেন, যিনি পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর। বাচ্চাদেরও পবিত্র- পাবন হবার জন্য জ্ঞান তো অবশ্যই চাই। জলেতে স্নান করে কি কেউ আর পবিত্র-পাবন হতে পারে। তোমরা তো জেনেই গেছো যে, শিববাবা স্বয়ং আমাদের সামনে (ব্রহ্মাবাবার) এই দেহতে অবস্থান করে আছেন। এই ব্রহ্মা দ্বারাই ব্রাহ্মণদের রাজযোগ শেখান। জাগতিক অন্যেরা তো অর্জুনের উদ্দেশ্যেও বলে যে

'ভগবানউবাচ'। কি আশ্চর্য্য কোথাও কোনও ব্রাহ্মণদের নাম নিশানাও নেই। কিন্তু, এটা তো কথিত আছেই যে, ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণুর দ্বারা পালন। অতএব স্থাপনা তো ব্রহ্মা দ্বারাই হবে, সে তো আর বিষ্ণু বা শঙ্কর দ্বারা অবশ্যই নয়। তোমারা বাচ্চাদের এই বুদ্ধি এখন সবে মাত্র প্রাপ্ত হয়েছে। বাবাকেই এখানে এই দুনিয়াতে আসতে হয়, সেখানে (শান্তিধামে) তো কোন আত্মা একা একা ফিরে যেতে পারে না। যে আত্মারাই আসে, তাকে অবশ্যই সতো, রজো, তমোতে অতিবাহিত করতেই হবে। কৃষ্ণ নিজেও পুরো ৮৪-বার জন্ম নেয় আর পুরো ৫ হাজার বর্ষ তার কর্ম-কর্তব্যের ভুমিকা পালন করেন। যেই আত্মা পেটের অভ্যন্তরে গর্ভে থাকে, তার ক্ষেত্রেও জন্ম হয়েছে ধরা হবে। কৃষ্ণের আত্মা যখন সত্যযুগেতে আসেন, অর্থাৎ গর্ভতে প্রবেশ করে, তখন থেকে হিসেব ধরে ৫ হাজার বর্ষে ৮৪ জন্মের কর্ম-কর্তব্যের ভুমিকা পালন করতে হয়। যেরকম শিবজয়ন্তী পালন করা হয় তখন তো (শিব) ওনার (ব্রহ্মার) শরীরেই অবস্থান করে থাকেন। কৃষ্ণের আত্মাও গর্ভেতে এসে যখন চঞ্চল হয়, ঐ সময় থেকে ৫ হাজার বর্ষের হিসাব শুরু হয়। এক্ষেত্রে হিসেবে যদি কম বেশি হয় তবে তো তা ৫ হাজার বছরেরও কম হয়ে যাবে। এটা অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধির ব্যাপার। বাচ্চারা তো বুঝতেই পারছো যে, কৃষ্ণের আত্মার আবার এই জ্ঞানের পাঠ নিচ্ছে, আবার সেই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ হওয়ার জন্য। তোমরাও এভাবেই এই কংসপুরী থেকে কৃষ্ণ-পুরীতে যাও। এই সব কথাই বাবা বসে তার বাচ্চাদের বোঝান। বাবা সতর্ক করে বলেন- মায়া যেমন বলবান তেমনি অদম্য। বেশ শক্তিশালী মহারথীদেরকেও অনায়াসে হারিয়ে দিতে পারে। জ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করতে করতে কখন যে গ্রহের দশা লেগে যায়। আশ্চর্যবৎ যারা আমার বাচ্চা হয়, তারাই বলে বসে ..... অহ মায়া (মোহময়ী মায়া), তারপরেও আবার ভাগন্তি হয়ে যায় (ছেড়ে চলে যায়)। পুরুষার্থে সঞ্চয়ের পরিবর্তে গ্রহের দশায় চলে যায়। এমনিতেই তো বর্তমান সময় কালের কারণে সবারই রাহুর গ্রহণ-দশা লেগে আছে। কিন্তু তোমাদের বাচ্চাদের উপর এখন বৃহস্পতির দশা বসে আছে। আবার জ্ঞানের পাঠে চলতে-চলতেই কারুর উপর রাহুর গ্রহণ-দশাও লেগে যায়, তখন তাদেরকে বলতে হয় - দ্যাখো এ এমনই মহান মূর্খ যে, এই দুনিয়াতে মূর্খ যদি দেখতেই হয়, তবে এনাকেই দেখো। তোমাদের আত্মা কিন্তু চায় যে, আমারা বাবার থেকে সদা সুখের আশীর্ব্বদের বর্ষাই নেবো। তাই তো বাবাকে বলো, বাবা, আমরা আপনার থেকে কল্প আগেও এই বর্ষা নিয়েছিলাম। আবার এখন আমরা আবার আপনার কাছেই এসেছি। তা শুনে বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান- বাইরে তোমাদের কেন্দ্রের সেন্টারে এরকম অনেকেই আসবে এই জ্ঞান বোঝবার জন্য। যেহেতু এটা হল ইন্দ্রসভা, এই ইন্দ্রই হলেন শিববাবা, যিনি জ্ঞানের বৃষ্টিতে সবাইকে স্নান করান। তাই তো এরকম পুণ্য সভাতে পতিত-পাপীরা কেউ আসতে পারে না। সবুজ পরী (পান্না), পোখরাজ (হলুদ) পরী এই মূল্যবান (জ্ঞানী) ব্রাহ্মণীরা পাণ্ডা হয়ে যায়। তাদেরকে এভাবে বলবে, তোমাদের নিজের সাথে কোনো বিকারীকে আনতে পারবে না। তা না হলে তোমরা দুজনেই তাতে দায়ী হয়ে যাবে। কোনো বিকারীকে সাথে আনলেও তার উপর অনেক কালিমা বা দাগ লেগে যায়। ফলে অনেক কঠিন সাজাও পায় সে। যেহেতু এই সব পরীদের উপর অনেক দায়িত্বই বর্তায়। এ কথাও তো বলা আছে, মান-সরোবরে স্নান করলেই হওয়া যায়। যেহেতু বাস্তবে এটা হল জ্ঞান-মান-সরোবর।

(শিব) বাবা মনুষ্য দেহে অধিষ্ঠিত হয়েই এই জ্ঞানের বর্ষা বর্ষণ করেন। উনি যে জ্ঞানের সাগর। আর তোমরা বাচ্চারা সব নদী স্বরূপ। নদীও আছে আবার সরোবরও আছে, এই জ্ঞানসাগরে বসিয়েই বাবা তার বাচ্চাদেরকে লায়ক (উপযুক্ত) বানান, স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য। যে স্বর্গে থাকে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য। এটাই হলো প্রবৃত্তিমার্গের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আবার এনারা বলে থাকেন, আমরা দুজনে তো জ্ঞান চিতায় বসে বসেই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবো। উঁচু-পদের অধিকারী হতে হবে যে। এমনিতেই অর্ধেক-কল্প তো আত্মারা ছটপট করতেই থাকে। তখন আত্মারা বাবাকে স্মরণ করে বলে, বাবা তুমি এসো, এসে আমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে পবিত্র-পাবন বানাও। বাবা তখনই ঈশারায় সাড়া দেন। ভারতবাসী যারা দেবী-দেবতাদের স্বীকার করেন, ওনারা নিশ্চয় ৮৪ বারের জন্ম ভোগ করেছেন। আর যারা দেবী-দেবতাদের ভক্ত আছেন, চেষ্টা করে তাদেরকেও তদ্রূপ বোঝাতে। তারা বোঝান বাবা কিভাবে এই ধরায় এসে ৩-টে ধর্ম স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ, সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী তিন ধর্মের স্থাপন করেন (শিব) বাবা। প্রথম অর্ধেক-কল্পে আর কোন ধর্ম স্থাপন হয় না। তারপর আবার অবশিষ্ঠ অর্ধেক-কল্পে -কত মঠ, কত পথ ইত্যাদি কত ধর্ম, অনেক অনেক ধর্মের স্থাপন হয়। কোথায় অর্ধেক-কল্পতে একটি মাত্র ধর্ম তাও সঙ্গমযুগেতে ভবিষ্যতের রাজধানী স্থাপনের জন্য। তাও এই পুরনো দুনিয়াতেই নিজের ধর্ম স্থাপন করেন। আর এখানে বাবা অর্ধেক-কল্পের জন্য একটিই মাত্র ধর্মের স্থাপনা করেন। আর কারুরই মধ্যে সেই শক্তি নেই। এই বাবা-তোমাদেরকে নিজের করে নিয়ে, সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশী ঘরানার স্থাপন করিয়ে, বাকি অন্য সবার বিনাশ সাধন করান। তখন সব আত্মারাই শান্তিধামে চলে যায়। কেবল তোমরাই এই সুখধামে আসতে পারো। ঐ সময়কালে দুঃখ বলে কিছুই থাকে না, যেহেতু এরা ভগবানকে স্মরণ করেছিল। এই জ্ঞানও তখন তোমাদের বুদ্ধিতে সজাগ থাকে। তোমরা তখন জানতে পারো যে এই বাবা যে জ্ঞানের সাগর। উনিই সেই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন। সাগর তো মাত্র একটাই । তুমি অবশ্যই নিজেকে সাগর বলবে না। বরঞ্চ তুমি ওনার সহযোগী হও, -তাই তো তোমাদেরকে জ্ঞান গঙ্গা বলা হয়। এছাড়া অন্য সব তো হলো জলের নদী। বাবা আবার বলেন আমার বাচ্চারা তোমরা সাগরের বাচ্চা হয়ে কাম চিতায় বসতে বসতে জ্বলে মরেছো, অর্থাৎ পতিত হয়ে পড়েছ। এখন আবার আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা পূর্ববৎ পাবন অবস্থায় আসবে। এই সৃষ্টির চক্র ৫ হাজার বছরের। এটাই তো কারও জানা নেই। সৃষ্টির চক্র পুরো ৪ ভাগে বিভক্তল। যাকে ৪ যুগ বলা হয়। এছাড়া আছে সঙ্গম যুগ, যাকে কল্যাণকারী বলা হয়। কুম্ভের মেলাকেও এভাবে বলা হয়। কুম্ভ বলা হয়ে থাকে- বিশেষ সেই মেলা-কে। যেখানে নদী এসে সাগরের সাথে মিশে যায়। যেমনটি আত্মারা এসে পরমআত্মার সাথে মেশে, একেও কুম্ভ বলা হয়। এই আত্মা আর পরমআত্মার মিলনই তোমরা দেখে থাকো। তোমরা নিজেদের মধ্যেও তো মেলামেশা করো, সেমিনার অর্থাৎ (বিশেষজ্ঞদের সভা) করে থাকো। একে কিন্তু কুম্ভ বলা চলবে না। যেহেতু সাগর তো তার নিজের জায়গায় অবস্থান করছে। এই (ব্রহ্মা) দেহতেই তিনি থাকেন। যেখানেই এনার (ব্রহ্মার) দেহ থাকে সেখানেই জ্ঞানের সাগর আছেন। এছাড়া অবশ্য তোমরা নিজেদের মধ্যে যে মেলামেশা করো তাকে জ্ঞানগঙ্গার মেলামেশা বলা চলে। নদী তো ছোট- বড় বিভিন্ন আয়তনেরই হয়। যেখানে আবার অনেকেই

স্নানের উদ্দেশ্যেই যায়। এরকমই তো গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ইত্যাদি রয়েছে। এই দিল্লী যমুনার তীরে অবস্থিত- অর্থাৎ স্বর্গ। প্রকৃত অর্থে যা কৃষ্ণপুরী। তাই তো দিল্লীর ক্ষেত্রে বলে থাকে এটাই ছিল পরীস্থান। যখন তা লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। কিন্তু এরকম বলা মোটেই উচিত হবে না যে, তা কৃষ্ণের রাজত্ব ছিল। রাধা- কৃষ্ণ একত্রে যুগল হলে, তবেই রাজত্ব করতে পারে। তোমরা বাচ্চারা তাইতো কত খুশীতে থাকো। মায়ার তুফান তো অনেকই আসবে। যা বেহদের বক্সিং (মুষ্ঠিযুদ্ধ)। প্রত্যেকের এক একজনের ৫ বিকারের সাথে যুদ্ধ চলে। তারা ভাবে আমরা চাই বাবাকে নিরন্তর যোগের স্মরণে থাকি। কিন্তু, মায়া আমাদের সেই যোগকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এরকম একটা খেলাও আছে, যাতে দেখানো হয়, একদিকে পরমাত্মা যাকে নিজের দিকে টেনে আনেন, অপরদিকে মায়া টানেন তার নিজের দিকে। *(দড়ি টানাটানি খেলার মতন)। এরকম একটা নাটকও বানানো হয়েছিল। বায়স্কোপের এই ফ্যাসান তো এখন বেরিয়েছে। তোমাদের নাটক অনুসারে এই বায়স্কোপকেই উপমা দিয়ে বোঝাতে হবে। নাটকেরও অদল- বদল তো হয়েই থাকে। কিন্তু এই অনাদি অবিনাশী নাটক তো সেভাবেই তৈরি হয়েছে। যা এবং যেভাবে তৈরি হয়েছিলো সেটাই আবার সেভাবেই তৈরী হচ্ছে ..... কেউ মারা গেলে বলা হয় যে, এইটুকুই ছিল তার কর্ম-কর্তব্যের ভুমিকা, তাই অযথা কেন আমরা তার জন্য বৃথা চিন্তা করব। এ সবই তো হয়েছে যা নাটকের চিত্রপটেই আছে । আত্মা একবার শরীর ছেড়ে দিলে, দ্বিতীয় বার তো আর সেই আত্মা, সেই শরীরে ফিরে আসতে পারে না। তাই কান্নাকাটি করে আর কি বা হবে। যেহেতু এর নামই তো দুঃখধাম। সত্যযুগে মোহজিত নামে এক রাজা ছিলেন। যার উপর এক সুন্দর গল্পও আছে। সত্যযুগে তো মোহ-এর কোনও কথাই হতে পারে না। কিন্তু এই কলিযুগে এখানে তো মনুষ্যেরা কি মোহতে আচ্ছন্ন। কারুর যদি সাধারন ভাবে কান্না না আসে তো নকল ভাবে হলেও সে নিজে কেঁদে অন্যকেও কাঁদিয়ে দেবে। তবেই তো প্রমাণ হবে যে, সে এত আফসোস্ করছে। তা না হলে গ্লানি-নিন্দার পাত্র হয়ে যাবে। কেবলমাত্র ভারতেই এইসব নিয়মের রেওয়াজ আছে। একদা যা ছিল এই ভারতেই চরম সুখ, আবার বর্তমানে এই ভারতেই অতি দুঃখের প্রকাশ হয়। এই ভারতেই কখনও ভগবান-ভগবতীরা রাজত্ব করেছিল। বিদেশীরা সেই পুরনো চিত্র খুব আনন্দে কিনে নেয়। পুরনো জিনিষেরই কদর হয় বেশী। সব থকে পুরনো শিব, উনি তো এখানে এই ভারতেই প্রকট হয়েছিলেন, লোকেরা যার কত পূজা করে। এখন আবার সেই শিববাবাই তো এসেছেন এখানে। তবে কি তোমরা তার পূজা করবে না এখন। যখন উনি এসে চলে যান, তখন তো ওনার পূজা করতে থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি (সিকিলধে) কল্প পূর্বের হারিয়ে পাওয়া হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী (ঈশ্বরীয়) বাবার রুহানী (ঈশ্বরীয়) বাচ্চাদেরকে জানায় নমস্কার।

ধারনার জন্য মুখ্য সারঃ-

১)অবিনাশী নাটকের এই জ্ঞানকে বুদ্ধিতে ধারণ করে নিশ্চিন্ত হতে হবে। কোনও প্রকারের চিন্তা করা উচিত নয় কারণ বুঝতে হবে যে, নাটকের ঘটনাগুলি চক্রের নিয়মেই পুনারাবৃত্তি হচ্ছে ..... তাই নির্মোহী হতে হবে।

২)বাবার দ্বারা যেহেতু এখন বৃহস্পতির গ্রহ-দশা চলছে তাই তাকে রক্ষা করতেই হবে, যাতে রাহুর গ্রহন-দশা না লাগে। কোন গ্রহের দশা হলে, জ্ঞান দানের দ্বারা তার সমাপ্তি ঘটাতে হবে।

বরদানঃ- শক্তি-রূপের স্মৃতির দ্বারা পতিত সংস্কারকে বিনষ্ট করে কালীর রূপে স্থিত ভব (হও)।

সদা নিজের এই স্মৃতিতে থাকো যে আমি সর্বশস্ত্রধারী শক্তি স্বরূপ। আমারর মতন পতিত-পাবন আত্মার উপর কোন পতিত আত্মার নজরের ছাওয়াও যেন পড়তে না পারে। পতিত আত্মার পতিত সঙ্কল্পও যাতে চলতে না পারে এরকমই নিজের এক শক্তিশালী ব্রেকের প্রয়োজন। যদি কোন পতিত আত্মার প্রভাব পড়ে তো এর অর্থ হলো তুমি আদৌ প্রভাবশালী নও। যে নিজেই স্বয়ং বিনাশকারী, সে কখনও কারো দ্বারা শিকার হতে পারে না। তাই তো এরকম কালী রূপধারী হও যে, কেউই তোমার সামনে সে ধরণের সঙ্কল্প করলেও, তার সঙ্কল্প যেন মূর্ছিত (অসাড়) হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- রয়্যাল (রাজকীয়) রূপের ইচ্ছার স্বরূপ হল - নাম, মান আর শান।